১৯৯১ সালের ভয়াল ২৯ এপ্রিলের ৩৪ বছর

# ঋণ নয় দুর্যোগ সক্ষমতা অর্জনে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকার পরিকল্পনা তৈরি করুন

## ১. প্রারম্ভিকা

১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলসহ পূরো উপকূলবাসীর জন্য এক দুঃসহ স্মৃতির নাম। এই দিন ২৫০ কিলোমিটার গতির তীব্রতাসম্পন্ন স্মরণকালের ভয়াবহ সুপার সাইক্লোন ''ম্যারি এন" চট্টগ্রামের উপকূলে আঘাত হানে এবং ৬মিটার (২০ ফুট) উঁচু জলোচ্ছাসে তলিয়ে যায় বিস্তর্ন অঞ্চল, ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভোলা, নোয়াখালীর হাতিয়া, চট্টগ্রামের সন্দীপ, আনোয়ারা, বাঁশখালী, কক্সবাজারের চকরিয়া, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া অঞ্চলসহ দেশের ১৩টি উপকূলীয় জেলার শত শত ইউনিয়ন। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৬৬ জন, মারা যায় ২০ লাখ গবাদিপশু, ১ কোটি মানুষ বাস্তচ্যুত হয় ও ৭ লাখ ৮৮ হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। সম্পদহানির মূল্য সরকারি হিসাবে ২৫ হাজার কোটি টাকা (১.৫ বিলিয়ন ডলার)। প্রলয়ংকারী এই ঘূর্ণিঝড়ের ৩৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো স্বজন হারাদের আর্তনাদ থামেনি, গৃহহারা মানুষগুলোর অনেকেই খুজে পায়নি আজো মাথা গোঁজার ঠাঁই। ২৯ এপ্রিলের সেই ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে উপকূলবাসীর কাছে প্রতিবছর দিনটি ফিরে আসে, ঘূর্ণিঝড়ের পর ৩৪ বছর পেরিয়ে গেলেও, টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষা ইস্যু বরাবরের মতোই আবহেলিত, এখনো দুর্যোগের খবরে উপকূলবাসীর দিন কাটে শংকা ও উৎকণ্ঠায়।

## ২. দিন দিন বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা-তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পরেও বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হেনেছে একের পর এক শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেলেও টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত।

**বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় ও সময়কাল**

| ক্রম | ঘূর্ণিঝড় | সময়কাল | ক্রম | ঘূর্ণিঝড় | সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সিডর | ৯ নভেম্বর ২০০৭ | ০৭ | মোরা | ৩০ মে ২০১৭ |
| ০২ | নার্গিস | ৩ মে ২০০৮ | ০৮ | ফনী ও বুলবুল | ৩ মে ও ৯ নভেম্বর ২০১৯ |
| ০৩ | আইলা | ২৫ মে ২০০৯ | ০৯ | আমফান | ২০ মে ২০২০ |
| ০৪ | মহাসেন | ১০ মে ২০১৩ | ১০ | সিত্রাং | ২৫ অক্টোবর ২০২২ |
| ০৫ | কোমেন | ৩০ জুলাই ২০১৫ | ১১ | মোখা | ১৪ মে ২০২৩ |
| ০৬ | রোয়ানু | ২১ মে ২০১৬ | ১২ | রেমাল | ২৬ মে ২০২৪ |

গবেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশে বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। আগে যে ধরনের বড় ঝড় ১০০ বছরে একবার হতো, এখন তা ১০ বছরেই হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (সিসিডিআর) এর তথ্য বলছে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়, উক্ত প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের কৃষি জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ কমে যেতে পারে এবং বন্যার মুখে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি ভিত্তিরেখার তুলনায় ৯% পর্যন্ত কমতে পারে।

## ৩. বাড়ছে আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির সংকট:

আইডিএমসি'র গবেষনা অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনের ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে বাস্তুচ্যুত হবে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট-২০২৪-এ বলা হয়েছে শুধু মাত্র ২০২২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তচ্যুত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, প্রতি বছর ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে, প্রতিদিন ২ হাজার মানুষ ঢাকায় পাড়ি জমাচ্ছে জীবিকার প্রয়োজনে এবং তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই জলবায়ু-বাস্তচ্যুত। ধারনা করা হচ্ছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, নদীভাঙ্গন, ভূমিধস এবং খড়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতার কারনে অভ্যন্তীরন বাস্তচ্যুত মানুষের সংখ্যা আসন্ন বছরগুলোতে আরো প্রকট হবে।

## ৪.ঋন নয় জাতীয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়ায় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

পূর্বে যে সমস্ত পরিকল্পনা [যেমন- মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারেটি প্ল্যান, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা-ন্যাপ, কার্বন নির্গমন হ্রাসে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান-এনডিসি ইত্যাদি] প্রণয়ন করা হয়েছে সে সমস্ত পরিকল্পনায় প্রকল্প ভিত্তিক অর্থ যোগান ও এর যথেচ্ছ ব্যয়কেই প্রধান্য দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, দুর্নীতি হ্রাসে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কৌশল, সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্থ ভৌগলিক অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নে অর্থায়নের কৌশলসহ নানাবিধ বিষয়ে দিক নির্দেশনার ঘাটতি রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রণীত এসকল কর্মপরিকল্পনা মূলত বৈদিশিক ঋণ নির্ভর, ঋণ ছারা এসকল প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, এই ধরনের প্রকল্পগুলো জাতীয় বাজেটের সাথে খুব কমই সম্পর্কিত তাই এসব জলবায়ু নীতি-পরকিল্পনায় প্রয়োজনীয় পরর্বিতন ও সংস্কারের প্রয়োজন। জাতীয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণমুলক প্রক্রিয়ায় অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, ঋণ নির্ভর প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা থেকে সরে আসতে হবে। অন্যথায় জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋণ নির্ভরতা ও শর্তের জটিলতার ফাঁদে পড়তে হবে।

## ৫. জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওদের সরাসরি প্রকল্প পরিচালনা থেকে সরে এসে স্থানীয় এনজিওদের নেতৃত্ব প্রদানে সুযোগ দিতে হবে

আমরা মানবিক ও উন্নয়ন সহযোগিতায় পরিপূরকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ দুর্গত ও দরিদ্র দেশসমূহে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ বছর বছর যে তহবিল ব্যয় করে তা কতটা কার্যকর? এতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি কতটা উপকৃত হয়? এসব তহবিল ব্যবহারে তাদের সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণ কতটুটু? তহবিল পরিচালনা ব্যয়, মধ্যস্থতাকারী আইএনজিও'দের ব্যয় আর বাস্তবায়নকারী স্থানীয় এনজিওদের স্থায়ীত্বশীলতা কতটুকু সমাঞ্জসপূর্ণ?

আমরা মনে করি কোনও একটি সংস্থার পক্ষে সকল প্রয়োজনে সব কিছু করে ফেলার সক্ষমতা থাকা অসম্ভব। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাসমূহ এবং আইএনজিওগুলির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের চেয়ে তাদের মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। স্থানীয় এনজিও/ সিএসও, যাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং পেশাদার পরিপক্কতা রয়েছে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। এটি তাদের ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র এবং টেকসই খাত গড়তে সহায়তা করবে। সময় এসেছে আইএনজিও এবং দেশীয় এনজিও'র মধ্যে সমতা ও মর্যাদাভিত্তিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আত্মসম্মান এবং আত্ম উন্নয়নের বোধকে জাগ্রত করার।

## ৬. কমছে বৈদেশিক সহায়তা; দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশেরও বেশি এখনও নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত; ৬১ শতাংশ বাড়িতে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবন এলাকায় এই সমস্যা বিশেষভাবে তীব্র। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলে প্রান্তিক পর্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (ওয়াশ) সুবিধা সম্প্রসারণে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেছে, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিদেশী সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা ইউএসএইড এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিল। সাম্প্রতিক মার্কিন সরকারের বিদেশী সহায়তা কর্মসূচি স্থগিত ও ক্রমবর্ধমান হারে অনুদানভিত্তিক বৈদিশিক সহায়তা হ্রাসের ফলে এ খাতে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে তাই এই খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষনায় দেখা যায়, উন্নত স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং অনুকূল পরিবেশে প্রতি ১ ইউএস ডলার বিনিয়োগে ৪.৩ ইউএস ডলার ফেরৎ পাওয়া যায়। এই চলমান সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে, জাতীয় বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এছাড়াও, ইউনিসেফ, পিকেএসএফ [পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন] এবং এমআরএ [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি]-এর মতো উন্নয়ন অংশীদারদের আরো বেশি দায়িত্ব নিতে হবে বিশেষ করে-টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে জলবায়ু সহিষ্ণু লবণমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে তাদের বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে।

### ক. পরিবেশ রক্ষায় টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে

টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতার অভাব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অন্তরায়। মানব বর্জ্য এবং প্লাস্টিকের নির্বিচারে ব্যবহার পরিবেশগত বিপর্যয় বৃদ্ধি করছে, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি করছে, পাশাপাশি জলাবদ্ধতা এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস করছে। যদি এখনই টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া সম্ভব হবে না। পরিবেশ রক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ফেইকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, প্লাস্টিক রিসাইকেলিং প্ল্যান্ট এর মতো প্রকল্প গ্রহণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পাশাপাশি ইউনিসেফ, ইউএনডিপি এবং অন্যান্য জাতিসংঘের সংস্থা ছাড়াও, বাংলাদেশের পিকেএসএফ এবং এমআরএর মতো বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ রক্ষায় টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসা উচিৎ।

### খ. উপকূলে সুপেয় পানির সংকট দূরীকরণে জলবায়ু সহিষ্ণু লবণমুক্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে সুপেয় পানির তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে, অধিকাংশ অঞ্চলের নলকূপের পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে ফলস্বরূপ, খাবার পানির তীব্র সংকটে উপকূলীয় মানুষ বিশেষ করে-কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, খুলনা, সাতক্ষীরা,শ্যামনগর সহ প্রায় পুরো উপকূলীয় অঞ্চল। স্থানীয়রা দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে, পুকুর, জলাশয়,খাল এবং নলকূপের লোনা পানি পান করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, যার প্রধান শিকার হচ্ছেন নারী, কিশোরী, শিশু এবং বয়স্করা এবং এই সমস্যা দিনদিন প্রকট আকার ধারন করছে। অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির তীব সংকট দূরীকরণে জলবায়ু সহিষ্ণু লবণমুক্ত পানি শোধানাগার স্থাপনে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ অত্যান্ত জরুরী, এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের পিকেএসএফ এবং এমআরএর মতো বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ।

### ৭. বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে অভ্যন্তরীন বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে এবং উক্ত কৌশলপত্র বাস্তবায়নে ২০ বছর মেয়াদী একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ও অধিকার-ভিত্তিক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০৪২ গ্রহণ করে। ৬ বছর অতিবাহিত হলেও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ এখনো স্পষ্ট নয়।

ভবিষ্যৎ বাস্তচ্যুতির কঠিন সংকট মোকাবেলায় শুধু মাত্র কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এখনই তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া জরুরী। জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে বাস্তচ্যুতি প্রশমনে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, এখানে সরকারের বাড়তি নজর দিতে হবে। বিশেষ করে কৌশলপত্রে বাস্তবায়ন কর্মকাঠামোর প্রতিরোধ ধাপকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তচ্যুতি সংকট মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলোর বছর ভিত্তিক অগ্রাধিকার ও বরাদ্দ নির্ধারন করতে হবে এবং সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত করতে হবে।

### ৮. উপকূলীয় সুরক্ষায় টেকসইবাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে

সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় রেমাল আবারও প্রমাণ করেছে উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো, বিশেষ করে বাঁধগুলো কতটা দুর্বল এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় কতটা অক্ষম, আমরা দেখেছি বাঁশের বেড়া ও চট দিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাঁধ রক্ষার দৃশ্য। সরকারি-বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৭০-৮০% বাঁধই জলোচ্ছাস ও জোয়ারের পানি প্রতিরোধের অনুপোযোগী। কারন এসকল বাঁধের উচ্চতা পূর্ব থেকেই অনেক কম এবং মানসম্মত মেরামত ও ব্যস্থাপনা নিয়মিত নয়। যে কারনে জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার টেকসই বাঁধের প্রয়োজন।

বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও পোল্ডারের পরিমান প্রায় ৫,৭৫৪ কি:মি: (সরকারী হিসাবে)। এছাড়াও বিভিন্ন চরসমুহে লাখ-লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে যেখানে কোন বাঁধ নাই, তারা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বাস করছে। সব মিলিয়ে উপকূলে এই মুহূর্তে প্রায় ৬,৫০০ কি:মি: টেকসই বাঁধ প্রয়োজন। আমরা বলতে চাই, বেড়িবাঁধের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব ও মালিকানা স্থানীয় কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করতে হবে, ভোলার চরফ্যাশনে এই ধরনের মডেল থেকে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এর ফলে বাঁধ রক্ষনাবেক্ষনের খরচ হ্রাস পায় এবং বাঁধ টেকসই হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কাজে জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডকে তার কাজের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

**সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে: কোস্ট ফাউন্ডেশন]**
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
যোগাযোগের জন্য:
মো: আবুল হাসান, মোবাইল: ০১৭০৮১২০৩৩৩
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১